গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা | ২০ - ২৬ আগস্ট ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের স্মরণ দিবস উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের শিবপুর সেন্টারে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণ!

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চোখ ধাঁধানো কর্মসূচি, লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি, কোনও কিছুই আর এ সত্য চেপে রাখতে পারছে না যে দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য আজ এক বীভৎস চেহারা নিয়েছে।

স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, ব্রিটিশের অত্যাচার সহ্য করেছিলেন, জেলে গিয়েছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁরা যে বৈষম্যহীন, শোষণহীন এক সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন সফল হওয়া দূরে থাক, আর্থিক অসাম্য এমন চেহারা নিয়েছে যা ছিল তাঁদের দুঃস্বপ্নেরও অতীত। বৈষম্যের এই বীভৎসতার কথা শুধু আমরা কমিউনিস্টরা নয়, বুর্জোয়া মিডিয়া, বহু বুর্জোয়া পণ্ডিত এমনকি বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরাও বলতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ঘোষণা করেছিলেন— স্বাধীনতার উদ্দেশ্য প্রতিটি মানুষের চোখ থেকে প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুছে ফেলা। বলেছিলেন, যত দিন মানুষের চোখে অশ্রুবিন্দু থাকবে, আমরা জানব, আমাদের কাজ শেষ হয়নি। অথচ আজ স্বাধীনতার এতগুলি বছর পরে শুধু অশ্রুবিন্দু নয়, শোষিত নিপীড়িত মানুষের চোখে অশ্রুর ধারা বইছে। দেশের এক বিরাট অংশের মানুষের পেটে খাদ্য নেই, পরনে বস্ত্র নেই, মাথার উপর ছাদ নেই, রোগে চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই, চাকরি নেই— তাঁরা যেন নেই রাজ্যের বাসিন্দা, যেন এ দেশে বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই তাদের নেই। অথচ ৭৫ বছরে দেশে সম্পদবৃদ্ধি তো কম হয়নি। ভারত আজ আর্থিক বৃদ্ধিতে ধনী

আটের পাতায় দেখুন

■ *সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির ব্যাপক বেসরকারিকরণের কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির প্রতিবাদে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বানে সারা রাজ্য জুড়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় ১৪ আগস্ট। ছবি ঃ শিয়ালদা স্টেশন (সংবাদ দুয়ের পাতায়)*

বাসভাড়া জেগে ঘুমোচ্ছে সরকার

বাসভাড়া নিয়ে রাজ্য সরকার যে কৌশলী ভূমিকা নিয়ে চলেছে তাকে চরম নিন্দনীয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সাধারণ মানুষকে রুজির সন্ধানে প্রতিদিন বাড়ির বাইরে বের হতে হচ্ছে। লোকাল ট্রেন বন্ধ। বাসই একমাত্র পরিবহণ। এদিকে তেলের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। বাসমালিকরা বাড়তি ভাড়া দাবি করছেন। সরকার ভাড়া না বাড়ানোর কথা জানিয়ে দিয়েছে। এই চিত্রনাট্যের আড়ালে কী ঘটছে তা জানেন বাসমালিক আর সাধারণ যাত্রীরা, সরকার নাকি তারপর আর কিছু জানে না। মালিকরা ইচ্ছামতো ভাড়া আদায় করছে। যাত্রীদের সাথে বাস কন্ডাক্টরদের বচসা লেগেই আছে। প্রথম স্টেজের ৭ টাকা ভাড়া ১০ টাকা, দ্বিতীয় স্টেজের ৯ টাকার ভাড়া এখন ১৫ টাকা। তারপরের স্টেজগুলি মালিকদের ইচ্ছামতো। যাঁরা দূর থেকে লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করতেন তাঁদের একাধিক বাস পাল্টে গন্তব্যে পৌঁছতে হচ্ছে। ফলে ছোট সংস্থায় কাজ করা নিম্নআয়ের কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য যা খরচ করতে হচ্ছে তা প্রায় তাঁর দৈনিক মজুরির কাছাকাছি।

ভাড়াবৃদ্ধির খাঁড়া যখন মানুষকে প্রতিদিন এ ভাবে রক্তাক্ত করছে তখন রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী? পরিবহণ মন্ত্রী বলেছেন, কেউ ভাড়া বেশি নিলে যাত্রীরা যেন বর্ধিত ভাড়ার টিকিট নিয়ে গিয়ে থানায় এফআইআর করেন। তা হলেই প্রশাসন বাসমালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কী ভয়ানক কড়া প্রশাসন! কিন্তু 'কেউ বেশি ভাড়া নিলে' কেন? সব বাসেই যে বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তা কি মন্ত্রী কিংবা পরিবহণ দপ্তরের অজানা?

দুয়ের পাতায় দেখুন

এতটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতাকেও ভয় পাচ্ছে রাষ্ট্র

পেগাসাস

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কখনও 'গণতন্ত্রের মন্দির' বলে সংসদকে প্রণাম করেন, কখনও বা সংবিধানে মাথা ঠোকেন। কিন্তু তাঁর আমলে দেশের গণতান্ত্রিক পরিসর কীভাবে অবরুদ্ধ, বাকস্বাধীনতা, প্রতিবাদের অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা কীভাবে লাঞ্ছিত, ধর্ষিত, তা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল পেগাসাস স্পাইওয়্যার কেলেঙ্কারি।

অনলাইন সংবাদ পোর্টাল 'দ্য ওয়্যার' ১৯ জুলাই জানায়, ইজরায়েলি সংস্থা এনএসও-র তৈরি সফটওয়্যার পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে ভারতে বহু ব্যক্তির ফোনে বেআইনি ভাবে আড়িপাতা হয়েছে। সেই তালিকায় আছেন বহু সাংবাদিক, সমাজকর্মী, বিরোধী দলের নেতা, শিল্পপতি, প্রতিবাদী সাধারণ মানুষ, এমনকি বিচারপতি থেকে বিজেপির কিছু নেতা-মন্ত্রীও। যাদের সম্পর্কে বিজেপি সরকারের শীর্ষ তিন কর্তার সন্দেহ-অবিশ্বাস আছে, তাদের ফোনেই নজরদারি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্রের সংস্থার নানা দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চালিয়েছিলেন যে সাংবাদিক, বিজেপি সরকারের রাফাল যুদ্ধবিমান কেলেঙ্কারি সম্বন্ধে প্রথম দেশবাসীকে অবহিত করেছিলেন যে সাংবাদিক, ওই কেলেঙ্কারির ফাইল হাতে পেয়েই রাতারাতি অপসারিত হয়েছিলেন যে সিবিআই প্রধান, রাফাল বিমান প্রস্তুতকারক ফরাসি সংস্থা দাসোর ভারতীয় এজেন্ট, তার বরাত পাওয়া ভারতীয় সংস্থার কর্তা সহ অনেকে আছেন এই তালিকায়। নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ছাড় দিতে অস্বীকার করেছিলেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা— তাঁর ফোনও পড়েছে নজরদারির আওতায়। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের যে মহিলা কর্মী, তাঁর নামও আছে এই তালিকায়।

২০১৯ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের ১৬টি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদসংস্থা একযোগে এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালিয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী নজরদারির তালিকায় থাকা বেশ কিছু ফোনের ফরেনসিক পরীক্ষা করিয়েছে ফরাসি

দুয়ের পাতায় দেখুন

বাসভাড়া ঃ জেগে ঘুমোচ্ছে সরকার

একের পাতার পর

আর যদি তাই হয়, তবে তো দপ্তরটি এবং সেই দপ্তরের মন্ত্রীর থাকার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, বাসমালিকরা কত ভাড়া নিচ্ছে সে খবরটুকু রাখারও ক্ষমতা যে প্রশাসনের নেই, সেই প্রশাসনের কাছে যাত্রীরা অভিযোগ জানিয়ে সুরাহা আশা করতে পারে? আসলে সরকার চোরকে বলছে চুরি করতে, আর গৃহস্থকে বলছে সজাগ থাকতে!

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) অনেক আগেই রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল, সরকারি প্রতিনিধি, বাসমালিকদের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ এবং যাত্রী কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গড়া হোক। কমিটি বাস পরিষেবার আয়-ব্যয়ের হিসেব করে জনসমক্ষে রাখুক এবং সেই অনুযায়ী সরকার ভাড়া নির্ধারণ করুক। কিন্তু রাজ্য সরকার মূক এবং বধিরের ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকল। তার বোঝা বইতে হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ যাত্রীদের।

এ কথা ঠিক তেলের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। এত দাম বাড়ার কারণ কী? বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা বলছেন আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়াই এর কারণ। অথচ এটি একটি ডাহা মিথ্যে কথা। গত বছর লকডাউনের সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম শূন্যেরও নিচে চলে গিয়েছিল। সেই সময় ভারত সরকার বিপুল পরিমাণ তেল মজুত করে রেখেছিল। তা ছাড়াও গত বছর এপ্রিলে ব্যারেল প্রতি ১৯.৯০ ডলারে কিনেছে তেল। ২০১৪-তে অশোধিত তেল ছিল ব্যারেল পিছু ১৪০ ডলার। এ মাসের শুরুতে তা ৭০ ডলারেরও নিচে নেমে এসেছে। ফলে দেশে তেলের দামবৃদ্ধির কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের অজুহাত খাটে না। বাস্তবে এই দামবৃদ্ধির মূল কারণ, তেলের ওপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের চাপানো বিপুল কর ও সেস এবং তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফা। ২০১৪ সালে পেট্রল ও ডিজেল থেকে কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ছিল গোটা কর বাবদ মোট রাজস্ব আয়ের ৫.৪ শতাংশ। এখন তা হয়েছে ১২.২ শতাংশ। গত অর্থবর্ষে তেলের শুল্ক খাতে সরকারের আয় হয়েছে ৩.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা, যা এক বছর আগে ছিল ১.৭৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ তেলের উপর কর থেকে আয় বেড়েছে ৮৮ শতাংশ।

এ বার দেখা যাক বিজেপি সরকার তেলের উপর ট্যাক্স কী পরিমাণে বাড়িয়েছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রলে ট্যাক্স নিত ৯ টাকা ৪৮ পয়সা, ডিজেলে নিত ৩ টাকা ৫৬ পয়সা। ২০২১-এ নিচ্ছে যথাক্রমে ৩২ টাকা ৯০ পয়সা ও ৩১ টাকা ৮০ পয়সা।

পেট্রলে মোট ট্যাক্সের কেন্দ্র পায় ৬৩ শতাংশ এবং রাজ্য পায় ৩৭ শতাংশ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মতো না হলেও রাজ্য সরকারও ট্যাক্স হিসাবে কম টাকা রোজগার করে না। যতই তেলের দাম বাড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারের প্রাপ্যও ততই বেড়ে চলে। তাই শুধু তৃণমূল সরকারই নয়, কোনও রাজ্য সরকারকেই তেলের দাম বৃদ্ধির বিরোধিতা করতে দেখা যায় না।

যে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল, রাজ্য সরকার জনসাধারণকে এই ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা থেকে রেহাই দিতে চায় কি না। চাইলে নিজেরা যেমন তেলের উপর চাপানো ট্যাক্স কমাত, তেমনই যে কোনও উপায়ে কেন্দ্রীয় সরকারকেও বাধ্য করত ট্যাক্স কমাতে। তা ছাড়া অন্যান্য নানা উপায়ে বাসমালিকদের উপর থেকে আর্থিক চাপ কমিয়েও ভাড়ার তালিকাকে স্থির রাখা যেত। পাশাপাশি ভরতুকি দিয়েও ভাড়অ সঙ্কট সমাধান করা যেত। কিন্তু যাত্রীস্বার্থ অপেক্ষা বাসমালিকদের স্বার্থকে রাজ্য সরকার বড় করে দেখে বলেই এমন মূক ও বধিরের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে।

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের মানববন্ধন

শিলিগুড়ি

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ১৪ আগস্ট রাজ্যে ১০০টির বেশি স্থানে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের উদ্যোগে সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা মানববন্ধনের কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মঞ্চের নেতা প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির ব্যাপক বেসরকারিকরণ, লাভজনক সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, প্রতিরক্ষা, তেল-ক্ষেত্র, ইস্পাত, খনি, বন্দর, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ ও বিক্রি করে দেবার প্রতিবাদে সর্বত্র মানববন্ধন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতির ফলে দেশে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বাড়ছে, বেকারি সর্বোচ্চ মাত্রায়, মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া, কলকারখানা, চা বাগান, চটকল বন্ধ, কৃষক-শ্রমিক মারা কালা আইন গৃহীত হয়েছে। এ সবের বিরুদ্ধেই ছিল মানববন্ধন।

ভয় পাচ্ছে রাষ্ট্র

একের পাতার পর

সংবাদসংস্থা 'ফরবিডেন স্টোরিস' এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। তার ভিত্তিতেই সামনে এসেছে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ খর্ব করে ভারত সহ একাধিক দেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলির এই নজরদারি চালানোর প্রক্রিয়া। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, যখনই কোনও সাংবাদিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছেন বা দুর্নীতি ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ভোট সামনে এসেছে অথবা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়েছে, শাসকদলের কোনও নেতা একটু অন্যদিকে ঝুঁকছেন বলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়গুলিতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ফোনে আড়িপাতার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এলগার পরিষদ সংক্রান্ত যে মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামী রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে প্রাণ হারিয়েছেন, সেই মামলায় অভিযুক্ত একাধিক জনের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফোনে জাল নথি বসাতে স্পাইওয়্যারের ব্যবহার হয়েছিল বলে জানিয়েছে আমেরিকার ডিজিটাল ফরেনসিক গবেষণা সংস্থা 'আরসেনাল কনসাল্টিং'। একটা নিরীহ ইমেলের মাধ্যমে এই স্পাইওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অজানা নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ কল, ভিডিও মেসেজ, কোনও বিশেষ লিংক অথবা সাধারণ কল যার মধ্যে স্পাইওয়্যার আছে, স্মার্টফোন ব্যবহারকারী না জেনেই তা গ্রহণ করলে নজরদারির শিকার হয়ে পড়েন। তাঁর অজান্তেই স্পাইওয়্যার তাঁর সব কথা শোনে, ছবি তোলে, তাঁর প্রতিটি চলাফেরার খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে সার্ভারে পাঠিয়ে দেয়। দীর্ঘক্ষণ ফোন ব্যবহার না করলেও এই ডিজিটাল গুপ্তচর তার কাজ করে যায়। এ জন্য ব্যাটারি এবং মোবাইল ডাটার খরচ এতটাই কম হয় যে, শিকার হওয়া ব্যক্তির সহজে সন্দেহ হয় না। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে স্পাইওয়্যারের সার্ভারে বসে থাকা নজরদার যদি বুঝতে পারে তাদের শিকার কোনও সন্দেহ করছে এবং ফোনটি সে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করছে— সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যাল পেয়ে স্পাইওয়্যারটি নিজের 'স্বেচ্ছামৃত্যু' ঘটায়। ফলে খুব উন্নত ল্যাবরেটরিতে ফোনটি পরীক্ষা না করালে এর অস্তিত্ব বোঝাই দুষ্কর। বিশ্বের বহু দেশে এক সঙ্গে অভিযোগ ওঠায় সাফাই দিতে গিয়ে এনএসও কোম্পানি জানিয়েছে, ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা দপ্তরের ছাড়পত্র নিয়ে তারা কেবলমাত্র সরকারগুলিকেই এই সফটওয়্যার বিক্রি করে। অর্থাৎ নজরবন্দি করার এই প্রক্রিয়া সরকারের মদতেই ঘটেছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবিদার ভারতের শাসক শ্রেণি এভাবেই ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে চলেছে।

পাশাপাশি, বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও ভারত সরকার কিছুতেই জানাচ্ছে না, তারা এই সফটওয়্যার কবে কিনেছে এবং কীভাবে তা কাজে লাগিয়েছে। এ নিয়ে তদন্তের আদেশ দূরে থাক, সংসদে আলোচনা করতেও তারা নারাজ। পেগাসাস সফটওয়্যারের অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠায় বিশ্বের একাধিক দেশ তা নিয়ে তদন্তের আদেশ দিয়েছে। মাত্র দুটি দেশ তদন্তে নারাজ। এর একটি ভারত। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে ইতিমধ্যেই একটি সরকারি তদন্ত পেগাসাস যে সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাদের ফোনে আড়িপাতার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিশ্চিত করেছে।

এনএসও কোম্পানির দাবি, তাদের এই নজরদারি সফটওয়্যারের জন্যই নাকি সন্ত্রাসবাদী, অপরাধী, শিশু পাচারকারী, ধর্ষক ইত্যাদিদের উপর নজরদারি করা যাচ্ছে! কিন্তু কোনও দেশের সরকারই মানুষকে জানায়নি সাধারণ মানুষের ব্যক্তি পরিসরে আড়ি পেতে কোথায় কোন অপরাধটি তারা কমাতে পেরেছে। বরং দেখা যাচ্ছে, কমা দূরে থাক, সন্ত্রাসবাদ, নারী ও শিশু পাচার, ড্রাগের কারবার, শিশু-কিশোরীদের উপর নির্যাতন ধর্ষণের দাপট বেড়েই চলেছে। মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, সন্ত্রাসবাদী থেকে ড্রাগকারবারি, কিংবা দুর্নীতিবাজ অথবা ধর্ষক— এদের সকলের প্রধান মদতদাতা এবং আশ্রয়দাতা হচ্ছে শাসকরাই। শাসকদের মদত ছাড়া ভারত সহ নানা দেশে অপরাধীরা এতটা লাগামছড়া হয়ে উঠতে পারে কি? তাছাড়া, অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণের কথা যুক্তির খাতিরে ধরে নিলেও প্রশ্ন ওঠে, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, বিচারপতিদের উপর নজরদারির অজুহাত কী?

পেগাসাস কিনতে ভারত সরকার কত খরচ করেছে তার হিসাব পাওয়াও কঠিন। তথ্য বলছে, ২০১৭-১৮ সালে 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়'-এর বাজেট ১০ গুণ বাড়িয়ে ৩৩৩ কোটি টাকা করা হয়েছিল। ঠিক তারপরেই ব্যাপকভাবে ভারতে পেগাসাস সফটওয়্যার ব্যবহার শুরু হয়। সাইবার সিকিউরিটির নামে এই দফতরই আড়িপাতার কাজে মুখ্য ভূমিকায় বলে অভিযোগ উঠেছে। নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাজ হল প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া, কোন ক্ষমতা বলে তিনি দেশের মানুষের কথায় লাগাম পরানোর কাজ কাঁধে তুলে নিলেন? এ কথার উত্তরও বিজেপি সরকারকেই দিতে হবে।

দেশের আইন বলছে, সরকার যদি অত্যন্ত জরুরি কারণে কারও ফোনে আড়িপাতার দরকার মনেও করে, তাহলে তাকে বিশেষ অনুমতি নিতে হয় কেন্দ্রের বা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছ থেকে। পেগাসাসের ঘটনা বলছে, সে আইনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার।

আজ ভারত সহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশে শোষণ-যন্ত্রণা যত বাড়ছে, বাড়ছে মানুষের বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ মাঝে মাঝে আন্দোলনে ফেটেও পড়ছে। শাসকরা জানে এই বঞ্চিত, রিক্ত, ক্ষুব্ধ মানুষ যদি সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শকে ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমস্ত তাকত, সমস্ত সৌধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। তাই শাসকরা আজ সামান্য কোনও প্রতিবাদ, সামান্য কোনও ভিন্ন স্বরও সহ্য করতে নারাজ। যে কোনও বিরুদ্ধ মতের গলা টিপতে তারা আজ অতি সচেতন। তাই এইভাবে মানুষের সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করার আয়োজন করতে হয়েছে তাদের। এক সময় বুর্জোয়া গণতন্ত্রই ব্যক্তি পরিসরের স্বাতন্ত্র এবং গোপনীয়তার স্বীকৃতি দিয়েছিল। এখন সেই পরিসরটাও তারা কেড়ে নিচ্ছে। পেগাসাস কেলেঙ্কারি দেখিয়ে দিয়ে গেল, এই বুর্জোয়া ব্যবস্থা আসলে আজ চরম ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। মানুষের গলা টিপে ধরে শাসন করতে হচ্ছে তাদের, এ পেশি আস্ফালন বুর্জোয়া ব্যবস্থার স্বাস্থ্য নয়—চরম ক্ষয়ের লক্ষণ। যা তার সারা গায়ে দগদগে ঘায়ের মতো ফুটে বেরিয়েছে। দেখিয়ে গেল, এই ব্যবস্থার ধ্বংস আজ সময়ের অপেক্ষা। সেই ধ্বংসস্তূপের উপর মানুষ জন্ম দেবে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের। যে সমাজে বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা কারও দয়ার দান নয়, সচেতন সংঘবদ্ধ মানুষের অর্জিত এক মহান অধিকার হিসাবেই রক্ষিত হবে।

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন আজও স্মরণ করব

প্রভাস ঘোষ

২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র দেশের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ইংরেজিতে একটি আলোচনা করেন যা অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়। ৫ আগস্ট মহান এঙ্গেলসের ১২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সেই ইংরেজি আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। এবার প্রথম পর্ব।

— সম্পাদক, গণদাবী

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক মহান পথিকৃৎ ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ২০০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে আমরা এই সভার আয়োজন করেছি। আমরা যদি বলি মার্কসবাদ বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তা হলে তা সঠিক। কিন্তু যদি শুধু 'মার্কস' বলি, মনে হবে কিছু যেন বাদ থেকে যাচ্ছে। ঠিক তেমনই, যদি আপনি কেবল 'এঙ্গেলস'-এর নাম উল্লেখ করেন, কিছু একটা অনুপস্থিত থেকে যায়। কিন্তু যদি বলেন 'মার্কস-এঙ্গেলস', তা হলে কথাটা যেন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয়, যেন একজন মানুষের নাম। যদিও তাঁরা শারীরিকভাবে দু'জন মানুষ ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্তা-ভাবনায়, আদর্শগত উপলব্ধিতে, ধারণায়, বাস্তব-প্রয়োগের কর্মকাণ্ডে এবং আবেগময় সম্পর্কে একজন মানুষের মতোই ছিলেন। যদি আমি তাঁদের যোগ্য ছাত্র কমরেড লেনিনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করি, আমরা তা ঠিক মতো বুঝতে পারব। লেনিন বলেছেন, "অতীতে পুরাগাথা বন্ধুত্বের দৃষ্টান্তের অনেক মর্মস্পর্শী কাহিনি শুনিয়েছে। ইউরোপীয় সর্বহারারা এ কথা বলতেই পারে যে, দু'জন মহাজ্ঞানী এবং সংগ্রামী মানুষ তাঁদের বিজ্ঞানকে গড়ে তুলেছেন, যাঁদের সম্পর্ক মানব-বন্ধুত্বের সমস্ত প্রচলিত মর্মস্পর্শী পুরা-কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। এঙ্গেলস সর্বদাই নিজেকে মার্কসের পিছনেই রেখেছেন"। (সূত্র ঃ ঐ)

তিনি লিখেছেন, "মার্কসের সাথে আমি সব সময়ই দ্বিতীয় বেহালা-বাদক হিসাবে ছিলাম। যখন তাঁরা উভয়েই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির জন্য পথ খুঁজতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তুলতে তীব্র সংগ্রামে নিয়োজিত, তখন এটি ছিল তাঁদের কমরেডশিপের সর্বোত্তম আবেগময় প্রকাশ। আবেগময় সম্পর্কের এই অতুলনীয় উদাহরণ আমাদের কাছে শিক্ষণীয়।" (১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লিখিত)।

আমরা বিশ্বাস করি, সর্বহারা শ্রেণির এই দুই মহান নেতার ঐতিহাসিক অবদানের জন্য সমগ্র মানবজাতি তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমাদের এই দাবি কি বাহুল্যপূর্ণ? যে মানুষটি ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন এবং যাঁর মৃত্যু ১৮৯৫ সালে, তাঁকে আজও কেন আমরা স্মরণ করছি? কী ভাবে তিনি আমাদের আজকের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আছেন?

বর্তমান পরিস্থিতি

আমরা জানি, বর্তমানে আমরা চরম দুর্দশা ও ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। আমি শুধু ভারতবর্ষের কথাই বলছি না, সারা দুনিয়ার কথাই বলছি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক— সমস্ত দিকেই সমগ্র মানবজাতির অবস্থা দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে। জনগণের সামনে কোনও আশার আলো নেই। কোনও মরূদ্যান তো দূরের কথা, ভ্রান্তির একটা মরীচিকা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

আমরা দেখছি, গত কয়েক দশক ধরে এক

মহান এঙ্গেলসের মৃত্যুদিবস (৫ আগস্ট) উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের কেন্দ্রীয় দফতরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ সহ অন্যান্য কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

অন্তহীন মন্দা ক্রমাগত গভীর হচ্ছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, সমাধানের কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশ্বের মোট সম্পদের তিন-চতুর্থাংশ সমগ্র জনগণের মাত্র এক শতাংশের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তারা কারা? তারা হ'ল বৃহৎ কর্পোরেট, একচেটিয়া পুঁজিপতি; অন্য কথায় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা। অন্যদিকে অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ জনগণ মাত্র এক-চতুর্থাংশ সম্পদের মালিক। ওই ৯৯ শতাংশ মানুষকে যদি আরও ভাগ করি, তার ১০ থেকে ১৫ শতাংশকে বাদ দিলে অবশিষ্ট ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ কার্যত ভিখারি বা আধা-ভিখারির মতো বেঁচে আছে। বর্তমান প্রজন্মের কোটি কোটি যুবক বেকার, অর্ধ-বেকার আর ছাঁটাই কর্মী। প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছে, চিকিৎসার সুযোগটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদের অনেকে আত্মহত্যা করছে। লক্ষ লক্ষ শিশু রাস্তায় জন্ম নিচ্ছে— অনেকে জানেও না কে তাদের বাবা-মা। তারা খাদ্য সংগ্রহ করছে ডাস্টবিন থেকে, আর বড়লোকদের খাবারের উচ্ছিষ্ট থেকে।

রাজনৈতিক চিত্রটা কী রকম? গণতন্ত্রের নামে সর্বত্র ফ্যাসিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চলছে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষাবিহীন সংসদীয় গণতন্ত্র নিছকই এক সীমাহীন ভণ্ডামি। নির্বাচনের নামে শুধু পুঁজিপতিদের পছন্দের লোক বেছে নেওয়া। একচেটিয়া গোষ্ঠী ও কর্পোরেট সংস্থাগুলির নির্বাচনী নকল মহড়ার মধ্য দিয়ে তাদের ভৃত্যদের বেছে নিয়ে সরকারি ক্ষমতায় বসায়। নির্বাচনের রায় নির্ধারিত হয় তাদের টাকার জোরে, জনমতের জোরে নয়। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি নিজেদের পছন্দের পার্টিকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য টাকার জোর, আমলাতন্ত্র, প্রচারমাধ্যম এবং পেশিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে "অবাধ ও নিরপেক্ষ" নির্বাচনের প্রহসন চালায়। সাধারণ মানুষও মনে করে, নির্বাচনের দ্বারা তাদের জীবনের কোনও পরিবর্তন হবে না, শুধু সরকারের পরিবর্তন ঘটবে মাত্র। তারা জানে, ভণ্ড, প্রতারক, ঠগবাজ বুর্জোয়া নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিই তারা শুধু শুনবে।

আমরা সম্প্রতি তথাকথিত বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন-প্রহসন দেখলাম। কী ঘটল সেখানে? এটা একটা লোকাল ক্লাবের নির্বাচনকেও লজ্জা দেবে। 'সির্ফ কুর্সি কি লড়াই'! এটা ছিল নিছক গদি দখলের লড়াই। এই তো ঘটল সেখানে! এটাই সর্বত্র ঘটছে — কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও বা গোপনে। রাজনৈতিক নেতারা জানে, জনগণ ক্ষুধার্ত, তারা ভিক্ষা করছে। শুধু কতগুলি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সামান্য কিছু টাকা ছড়িয়ে নেতারা তাদের ভোট কিনে নিতে পারে। জনগণও মনে করে, ওই টাকা আর স্থানীয় যুবকদের মদ-মাংসের ভোজ ছাড়া এই নির্বাচনে তারা কিছুই পাবে না। এই সবই চলছে। আর প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে পুঁজির স্বার্থে আমলাতন্ত্র সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে। বিচারপতিদের পদোন্নতি, বদলি এবং বিচারের রায় পর্যন্ত ঠিক হয় শাসক শ্রেণি ও মন্ত্রীত্বের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের ইচ্ছায়। এগুলি আজকাল খোলাখুলি আলোচনার বিষয়। প্রচার-মাধ্যমকে কারা নিয়ন্ত্রণ করছে? পুঁজির শক্তি। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিবাদের স্বাধীনতা— এসব আজ নিতান্তই ফাঁকা কথা। প্রতিবাদের কণ্ঠকে নির্মমভাবে স্তব্ধ করা হচ্ছে এবং চূড়ান্ত ও হিংস্রভাবে পর্যুদস্ত করা হচ্ছে।

মানব সমাজে মূল্যবোধ প্রায় ধ্বংস হতে বসেছে

প্রায় সমগ্র মানবজাতিই আজ মূল্যবোধহীন। অতীতে একটা সময়ে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করত। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক কারণেই যখন ধর্মীয় মূল্যবোধগুলি নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন এসেছে মানবতাবাদী মূল্যবোধ— যা পাশ্চাত্যে এসেছে নবজাগরণের সময়ে ও তার অনুসারী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে এবং আমাদের দেশ সহ উপনিবেশগুলিতে এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে। আজ যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শ প্রায় নিঃশেষিত এবং কমিউনিস্ট মূল্যবোধও সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তখন সমাজে কোনও মূল্যবোধই অবশিষ্ট নেই। বাস্তবে একজন মানুষ কোনও মূল্যবোধ, নৈতিকতা বা নীতিবোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক পরিবেশ থেকে সে এসব অর্জন করে। যদি সমাজে মূল্যবোধ থাকে, যদি সামাজিক চেতনা থাকে তাহলে একজন তার শৈশবকাল থেকে ধীরে ধীরে তা অর্জন করে। কিন্তু পুঁজিবাদী শাসকরা এসব পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মনুষ্যত্বহীন মানব। শারীরিকভাবে তারা মানুষরূপী, কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ বর্জিত। কী মর্মান্তিক পরিস্থিতি! ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি, কোমল মনের অনুভূতি— এগুলো সমাজে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এমনকি রোজগেরে ছেলেরা তাদের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখভালের দায়িত্ব নেয় না— পারিবারিক জীবনেও এটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। হয় তাঁদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়— যা তাঁদের কাছে জেলখানারই মতো, না হলে তাঁদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা রেলের প্ল্যাটফর্মে বা রাস্তায় ভিক্ষা করছেন। এমনকি সম্পত্তির লোভে বাবা-মাকে খুন পর্যন্ত করা হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও আবেগের সম্পর্ক নেই। সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের দাম্পত্য জীবনের সুন্দর সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আরও ভয়ঙ্কর বিষয় হল, নারীধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং খুন আজ দৈনন্দিন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনা মানব-ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। জন্তু জানোয়ারের জগতেও এরকম ধর্ষণ, গণধর্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি নব্বই বছরের বৃদ্ধা বা তিন বছরের শিশুও এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এই ধর্ষকরা এই পুঁজিবাদী সভ্যতার সৃষ্টি। এটাকে কি আদৌ সভ্যতা বলা যায়?

কেন আজও আমরা মার্কস এঙ্গেলসকে স্মরণ করব

কেন আজও আমরা মার্কস এঙ্গেলসকে স্মরণ করব? তাঁরা ছিলেন সেই চিন্তাবিদ, যাঁরা বহু আগেই পুঁজিবাদী সভ্যতার এই করুণ পরিণতি দেখতে পেয়েছিলেন, এর কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছিলেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসার কারণে মার্কস-এঙ্গেলস খুবই কষ্টসাধ্য এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। এটা এমন একটা সময় ছিল যখন ইউরোপে রেনেসাঁর প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি। সেই যুগটায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামে জয়-পরাজয় তখনও নিষ্পত্তি হয়নি। সেই সময় কিছু কিছু কলকারখানাও গড়ে উঠেছিল। শ্রেণি হিসাবে বুর্জোয়ারা আবির্ভূত হয়েছিল তাদের বিপরীত-সত্তা শ্রমিক শ্রেণিকে সঙ্গে নিয়ে। কোথাও কোথাও

সাতের পাতায় দেখুন

১৫ আগস্ট গণমুক্তি সংকল্প দিবস পালিত

১৫ আগস্ট ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসকে গণমুক্তি সংকল্প দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) সারা দেশের সাথে এ দিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায়, ব্লকে, প্রতিটি লোকাল কমিটি এই গণমুক্তির তাৎপর্য মানুষের সামনে তুলে ধরে। সর্বত্রই মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শন হয় এবং বুকস্টল হয়। ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা শীর্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের বইটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিক্রি করা হয়। সর্বত্রই সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। দলের লিফলেট এবং বই সংগ্রহ করেন। এস ইউ সি আই (সি)-এর সংগ্রামের প্রতি তাঁদের আস্থা ব্যক্ত করেন। (ছবি ঃ মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার)

চেতলায় ছাত্র আন্দোলনের জয়

সরকার নির্ধারিত ২৪০ টাকা ফি-তেই ছাত্র ভর্তি করার দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে দক্ষিণ কলকাতায় চেতলা বয়েজ স্কুলের ছাত্রদের আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চললেও শেষ পর্যন্ত ৯ আগস্ট ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্ররা তিন ঘণ্টা ধরে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করার পর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সেখানে উপস্থিত হন এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৫০ টাকা ফি বাতিল করে ২৪০ টাকা ভর্তি ফি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এ কথাও ঘোষণা করা হয় যে ইতিমধ্যে নেওয়া বাড়তি ফি ফেরত দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

বাড়তি ফি প্রত্যাহার সহ নানা দাবিতে আন্দোলনের সমর্থনে সই সংগ্রহ করছেন এআইডিএসও সদস্যরা।

আইসিডিএস-এর সুপারভাইজারে ৭২ শতাংশ পদ শূন্য

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের পরেই পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সুপারভাইজার শূন্য পদ রয়েছে। ব্লক স্তরে সিডিপিও বা চাইল্ড ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার পদেও শূন্যস্থানের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৪৭৭৯টি সুপারভাইজারের অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩৪৩৩টি পদ শূন্য, অর্থাৎ ৭২ শতাংশ পদ শূন্য। সিডিপিও-র ক্ষেত্রে ৫৭৬টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ১৯৩টি শূন্য পড়ে রয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা ৩৩ শতাংশ। রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, ২০০৭ সালে শেষ নিয়োগ হয়েছিল। অর্থাৎ তৃণমূল শাসনে কোনও নিয়োগই হয়নি।

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত ক্ষোভের সাথে বলেন, রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বহুবার শূন্যপদে সুপারভাইজার ও সিডিপিও নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে সুপারভাইজার নিয়োগের পরীক্ষা হলেও, নিয়োগ এখনও হয়নি। ফলে এই প্রকল্পের কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সেন্টারগুলো করোনা ও লকডাউনে বন্ধ থাকায় শিশুরা পরিষেবা পারছে না। সংগঠনের দাবি ১) অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে সুপারভাইজার ও সিডিপিও নিয়োগ করতে হবে। ২) যানবাহন সচল রেখে সমস্ত সেন্টার খুলে, রান্না করা গরম খাবার দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। ৩) ২০১৪ সাল থেকে বসে যাওয়া কর্মীদের সরকার ঘোষিত ৩ লাখ টাকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিক্ষোভ

কর্মচারীদের ২ মাসের বেতন বন্ধ, পিএফ, ইএসআই টাকা জমা না দেওয়া, প্রতি মাসে বেতন থেকে অন্যায় ভাবে এক হাজার টাকা কেটে নেওয়া সহ দীর্ঘদিনের বিভিন্ন বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে ৬ আগস্ট আইডিবিআই জোনাল অফিস শেক্সপিয়ার সরণিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ও অন্যান্যরা। চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারকে দাবিপত্র দেন। শতাধিক কর্মচারী বিক্ষোভে অংশ নেন। সংগঠনের নেতা সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল ও সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস বলেন, অবিলম্বে দাবিগুলি মেনে না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের ডাকে দাবি সপ্তাহ

অবসরের বয়স পঁয়ষট্টি বছর করা, স্থায়ীকরণ, পি এফ, পেনশন, সমস্ত স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এর অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয় ১৯ জুলাই।

ওই দিন থেকে এক সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনের বিশেষ কর্মসূচি পালিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করে দাবিপত্র জেলাশাসক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মহকুমা শাসক এবং পৌরসভার ও পৌর নিগমের চেয়ারম্যান ও মেয়রকে দেন। এই আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য সমস্ত স্তরের পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য সভানেত্রী সুচেতা কুণ্ডু।

বাঁকুড়ায় নাগরিক কনভেনশন

'৭৫ বছরের স্বাধীনতার আলোকে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বাধিকার' বিষয়ে ৭ আগস্ট বাঁকুড়ায় নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস। মাচানতলার ডিওপি হলে কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রবীণ সদস্য সুব্রত সিংহ।

প্রধান অতিথি ছিলেন সরকারি চিকিৎসক সংগঠন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের বিশিষ্ট সদস্য, বাঁকুড়া কোর্টের আইনজীবী হরিদাস ব্যানার্জী। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, ছাত্র নেতা অভ্রনীল মণ্ডল সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১০ আগস্ট ঝাড়খণ্ডের এসইউসিআই (সি) সরাইকেলা খারসওয়া কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ সভা

কোলাঘাট বিডিও অফিসে ধরনা

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে কোলাঘাট ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জলবন্দি। ওই এলাকার মধ্যে অবস্থিত দেহাটি-দেনান-টোপা ড্রেনেজ-সোয়াদিঘি প্রভৃতি খালগুলিতে জমে থাকা কচুরিপানা-মাছ ধরার জাল ও পাটা-জঞ্জাল সহ নানা আবর্জনা অপসারণ করে জমা জল নিষ্কাশন, ক্ষতিগ্রস্ত আমন ধান-ফুল-পান-সবজি চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে এলাকার জলবন্দি মানুষেরা কৃষক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১৩ আগস্ট কোলাঘাট বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ব্লক কৃষি আধিকারিক, সেচ দপ্তরের আধিকারিকে স্মারকলিপি দেন। কর্মসূচিতে দুই শতাধিক মানুষ ছিলেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, কার্যকরী সম্পাদক বিশ্বরূপ অধিকারী ও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির অফিস সম্পাদক অঞ্জন জানা প্রমুখ।

ডেপুটেশনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন গোপাল সামন্ত, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, প্রতাপ সামন্ত, মোহন দাস, প্রশান্ত সামন্ত, আশীষ ভৌমিক প্রমুখ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সেচ দপ্তরের এসডিও দ্রুত ওই জলবন্দি এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দেন।

বেকারত্ব চরমে অথচ সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ

সত্তরের দশকের বিখ্যাত সিনেমা ‘জনঅরণ্য’ তুলে ধরেছিল স্বাধীন ভারতে বেকারত্বের ভয়াবহ সমস্যা। পঞ্চাশ বছর পরে আজও এই রাজ্য সহ সারা দেশ জুড়ে বেকার সমস্যার আরও ভয়াবহ রূপ দেখছি আমরা। অথচ সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত সরকারি দলই দাবি করে এসেছে, তাদের আমলে প্রচুর চাকরি হয়েছে। প্রচুর চাকরি সত্যিই হলে এই ভয়াবহতম বেকার সমস্যা কি আকাশ থেকে পড়ল, না মাটি ফুঁড়ে উঠল?

অবিলম্বে সমস্ত সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ সহ অন্যান্য দাবিতে নদীয়ার রানাঘাটে আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটির বিক্ষোভ। ৯ আগস্ট

প্রতিটি পদে চাকরির জন্য লাখ-লাখ আবেদনপত্র জমা পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ২৩০টি বন-সহায়ক পদে আবেদনপত্র জমা পড়েছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। পুলিশের মাত্র ৬২টি পিয়ন পদের জন্য আবেদন পড়ে প্রায় এক লক্ষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়নের পদই হোক বা এনআরএস-এ ডোমের চাকরি অথবা রেলের গ্যাংম্যান— সব ক্ষেত্রেই আবেদন করেছেন স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি, এম টেক, বি টেক-এর মতো উচ্চশিক্ষিতরাও। শুধু তাই নয়, এ রাজ্যে শিক্ষিত যুবককে বেঁচে থাকার জন্য বেসরকারি সংস্থায় ঘর মোছা বা হোটেলে বাসন মাজা অথবা ট্রেনে হকারির কাজ করতে হয়। চাকরি না পেয়ে বা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পেয়ে আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে অনেকেই এবং সেই সংখ্যা বাড়ছে প্রতি বছর। এ দেশে প্রতি বছর অন্তত ৪৫ হাজার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেকারত্বের কারণে। সোনারপুরের এমএ পাস অতনু বা বালির স্নাতক বাপি, ঢাকুরিয়ার ইঞ্জিনিয়ার নীলাদ্রি অথবা ইংরেজিতে অনার্স বিএড পাস কালনার সন্ন্যাসী— এঁদের কথা আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি! এঁরা পড়াশোনা করেছিলেন চাকরি করে পরিবারের দায়িত্ব বহন করবেন বলে, জীবনটাকে একটু ভালো ভাবে কাটাবেন এই আশায়। বেঁচে থাকার অধিকার তাঁদের ছিল, কিন্তু বেকারত্ব তাঁদের বাঁচতে দিল না। কেন তাঁরা চাকরি পেলেন না? চাকরি নেই কেন?

পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকার প্রায় এক কোটিতে পৌঁছেছিল। বন্ধ হয়েছিল ছোট-বড় ৫৬ হাজার কল-কারখানা। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল তৈরির সময় কয়েক লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সিপিএম সরকার। কিন্তু সর্বসাকুল্যে কাজ হয়েছিল ৯০০ জনের। ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তুলে দিয়ে চালু করল এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক। যে ব্যাঙ্কে নাম লিখিয়ে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বছরের পর বছর বসে আছে, চাকরির দেখা নেই। চাকরি বলতে কিছু সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ, যার না আছে স্থায়িত্ব না উপযুক্ত বেতন! ২০১৩ সালে ঘটা করে যুবশ্রী প্রকল্প চালু হল। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন প্রতি বছর এক লক্ষ যুবশ্রীকে সরকারের নানা দপ্তরে কাজ দেওয়া হবে। পরবর্তী বছরে উঠে আসবে নতুন আর এক লক্ষ যুবশ্রী। কিন্তু আট বছর পরেও রাজ্যের প্রথম এক লক্ষ যুবশ্রীরই কাজ জোটেনি।

গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চাকরির নিয়োগ একদম তলানিতে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যতটুকু নিয়োগ হয়েছে, তা চুক্তিভিত্তিক। সিএমআইই-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে বেকারত্বের হার বর্তমানে ২২.১৪ শতাংশ। চটকল সহ বহু কলকারখানা বন্ধ, ক্ষুদ্র ব্যবসা সংকটগ্রস্ত। গ্রামে কাজ নেই। জনসংখ্যার ২০-৩০ শতাংশ কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। গত পাঁচ বছরে মহিলা বেকার লাফিয়ে বেড়েছে। রাজ্যে কর্মক্ষম মহিলাদের ৪১ শতাংশই বেকার। গত সাত বছরে শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তিই প্রকাশ হয়নি। রাজ্যের মানুষ গত কয়েক বছর ধরে দেখছেন, শিক্ষক, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় পাশ করে বসে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, খাদ্য দপ্তর, পুলিশের চাকরি, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং আরও নানা বিভাগ ধরলে রাজ্যে শূন্যপদের সংখ্যা ৫ লক্ষেরও অধিক। বছরের পর বছর নিয়োগ ঝুলে রয়েছে। নিয়োগের নামে দুর্নীতি, তাকে ভিত্তি করে মামলা আর নিয়োগ আটকে যাওয়া— চক্রাকারে এমনই চলছে।

বিশ্বে সব থেকে বেশি যুবকের বাস ভারতবর্ষে। কিন্তু সেই যুবসম্প্রদায়কে নিয়ে কোনও সরকারের কোনও ভাবনা নেই! চাকরির দাবিতে রাস্তায় নামলে জুটছে পুলিশের লাঠি-অত্যাচার। কেন্দ্র হোক বা রাজ্য— দুই সরকারই ‘পকোড়া ভাজো, তেলেভাজা ভাজো’— এ সব উপদেশ দেওয়া ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। সারা দেশে বেকারত্ব ১৪ শতাংশেরও বেশি। কিন্তু কর্মক্ষম মানুষের ক্ষেত্রে এই হিসাবটা আরও ভয়াবহ। সমগ্র ভারতবর্ষে কর্মক্ষম ৭৭ কোটি জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ বেকার।

সরকারি বেকারত্বের হিসেবে থাকে অনেক কারিকুরি। মূলত নথিভুক্ত বেকারদের যত শতাংশ কাজ পেল না তা দিয়ে তৈরি হয় বেকারের হিসাব। বাস্তবে নথিভুক্ত নয়, এমন বেকারের সংখ্যাটা নথিভুক্ত বেকারের থেকে অনেক বেশি। যে কোটি কোটি মানুষ, শিক্ষিত যুবক সামান্য মজুরিতে যে কোনও একটা কাজ করছে, তাদের বেকার হিসাবে ধরা হয় না। কায়িক পরিশ্রমের কাজ তবুও সামান্য কিছু জুটছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা যেখানে যত বেশি, বেকারত্ব সেখানে তত বেশি। গ্রামে কোনও রোজগার নেই। মানুষ কাজের আশায় শহরমুখী। শহরেও কর্মসংস্থানের হার সমগ্র দেশে ৪ শতাংশ থেকে সর্বাধিক ২৫ শতাংশ। শুধুমাত্র কোর ইন্ডাস্ট্রি নয়, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি- হেলথ সেক্টর-আইটি-টেলিকম সেক্টর, ব্যাঙ্ক-ফিনান্সিয়াল সার্ভিস-ট্রান্সপোর্ট- রিয়েল এস্টেট-ট্রেড-হোটেল ম্যানেজমেন্ট-রেস্তোরাঁ— প্রায় সর্বক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার ঋণাত্মক, -১০ শতাংশ থেকে -৫০ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ নতুন করে কোনও কাজ সৃষ্টি হচ্ছে না, উল্টে কাজ হারাচ্ছে মানুষ। সরকার নিজেই বলছে এপ্রিল ২০২০ থেকে ২০২১ এই এক বছরে দেশে কাজ হারিয়েছে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ। এ কথা ঠিক যে করোনা অতিমারির সময় বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিলেও পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে মানুষ কাজ হারাচ্ছিলই (সারণি দেখুন)।

সাল	কাজ আছে
২০১৬-১৭	৪০.৭৩ কোটির
২০১৭-১৮	৪০.৫৯ কোটির
২০১৮-১৯	৪০.০৯ কোটির
২০১৯-২০	৪০ ৩৫ কোটির
২০২১ জানুয়ারি	৪০ কোটির

অর্থাৎ, এই কয়েক বছরে ৭৩ লক্ষ লোক কমেছে। তেল কোম্পানি, রেল, বিএসএনএল সহ সরকারি দপ্তরে নতুন নিয়োগ বন্ধ। লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে। ইস্পাত-খনি-সার-সিমেন্ট শিল্পে চলছে ছাঁটাই। সরকারি শূন্যপদ তুলে দেওয়া হচ্ছে।

দেশের জনসংখ্যা যখন ৫০ কোটি ছিল তখন দেশের মানুষকে পরিষেবা দিতে বা তার প্রয়োজন মেটাতে সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে যত শ্রমিক-কর্মচারীর প্রয়োজন হত, আজ ১৩৯ কোটি দেশবাসীকে সেই একই পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকারি-বেসরকারি শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক তার উল্টো। মুনাফা বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। বাড়ছে কাজের সময়। চাকরির সুযোগ তৈরিতে সরকারকে বাধ্য করতে হলে চাই দুর্বার আন্দোলন। ইতিমধ্যেই সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের যুবকরা চাকরির দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নিজেদের লড়াইয়ের মঞ্চ গড়ে তুলেছেন।

প্রাইমারি-আপার প্রাইমারি, গ্রুপ ডি-গ্রুপ সি,পুলিশ বিভাগে চাকরিপ্রার্থী, যুবশ্রী, পার্শ্বশিক্ষক, প্যারাটিচার, প্রাইভেট টিউটর, বাইক-ট্যাক্সি চালক, ডেলিভারি বয় সহ আরও নানা ক্ষেত্রের যুবকরা লড়াইয়ের মঞ্চ গড়ে আন্দোলন করছেন। এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে অনলাইন জাতীয় কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বেকার যুবকদের দেশব্যাপী আন্দোলনের মঞ্চ ‘আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটি’। তারই ধারাবাহিকতায় রাজ্যে বেকার যুবকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মঞ্চ আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটি গড়ে উঠেছে। বেকাররা অধিকার বুঝে নিতে রাস্তায় নামছে— এটাই স্বস্তির এবং আশার।

স্বাধীনতা দিবসকে গণমুক্তি সংকল্প দিবস হিসাবে পালনের আহ্বান জানিয়ে শিয়ালদহে এআইডিওয়াইও কলকাতা জেলা কমিটির প্রচার। ১২ আগস্ট

হাওড়ায় এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সভা

স্বাধীনতার ৭৫তম দিবসে সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি, হাওড়া শাখার উদ্যোগে হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব মাজহার উল হক। সভায় বক্তব্য রাখেন বালি-বেলুড় আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক উত্তম চ্যাটার্জি, শিবপুর আঞ্চলিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা সৈয়দ শাবানা এবং হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মাধুরী ঝা, রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শাহনাওয়াজ। সভা সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী পদ্মলোচন সাহু। সভায় সকল বক্তা ধর্মের ভিত্তিতে ঘুরপথে সিএএ চালু করার বিরোধিতা করেন এবং প্রশ্ন তোলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কি দেশের ১৩৫ কোটি মানুষকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যে ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণির স্বার্থে এনআরসি কার্যকর করার চেষ্টা করছে সে কথাও তারা বলেন।

মধ্যপ্রদেশে বন্যাদুর্গতদের পাশে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

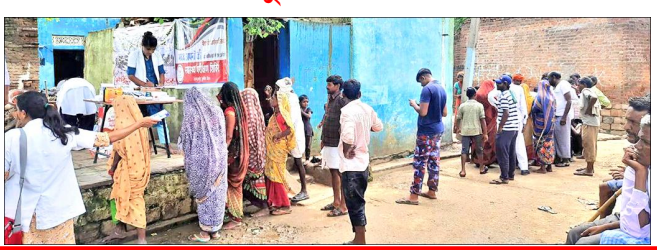

মধ্যপ্রদেশের ডবরা ও ভিতরবার তহসিলের গ্রামাঞ্চলে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ ও মেডিকেল ক্যাম্প করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

পাঠকের মতামত

শিক্ষার ব্লেন্ডেড মোড একটি ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ

১৯৫১ সালে কল্পবিজ্ঞানের লেখক আইজ্যাক আসিমভ একটি বই লিখেছিলেন ‘দ্য ফান দে হ্যাড’। এই কাহিনীতে রয়েছে একটি বাচ্চা মেয়ে মার্গি জোন্সের কথা। সে বাড়িতে বসে অনলাইনে পড়াশোনা করে। তার কোনও বন্ধু নেই, খেলার মাঠ নেই। সে তার ঠাকুরদার কাছে অবাক হয়ে পুরনো দিনের গল্প শোনে। একসময় নাকি স্কুল নামের প্রতিষ্ঠান ছিল, সেখানে মানুষ প্রজাতির মাস্টারমশাইরা বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতেন, তখন খেলার মাঠ ছিল, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ছিল। মার্গি যত শোনে ততই অবাক হয়ে যায়। সে তো রোবট টিচারের কাছে পড়ে! সে তো খেলতে যায় না! সেই কাহিনী অতিমারি আবহে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

২০২১-এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ যে ৪০ পাতার অনলাইন বা ব্লেন্ডেড মোড লেখাপড়ার খসড়া প্রকাশ করেছে তাতে পরিষ্কার হয়ে যায়, ভারত আগামী দিনে ছেলেমেয়েদের মার্গি জোন্স বানাতে চলেছে। কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরুর ইন্দাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ইসারা .২০ নামের একটি রোবট দিয়ে ক্লাস নিয়েছিল। এটাকে বলা যায় শুরু।

আমরা যারা কোভিড পরিস্থিতিতে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি ভালো করেই জানি কতরকম অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয় অনলাইন ক্লাসে। অনেক ছাত্র ক্লাসেই আসে না, অনেক ছাত্র ক্লাসে জয়েন করে অন্য কাজে চলে যায়। ছাত্রদের কাছ থেকে ফিডব্যাক তো দূর, তাদের সঙ্গে শিক্ষকদের কোনও মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে আগামী দিনের শিক্ষা হবে বেশিরভাগটা অনলাইনে, আর কিছুটা হবে অফলাইনে বা ক্লাসরুমে। এই ব্লেন্ডেড মোডে মাস্টারমশাইদের সংজ্ঞা বদলে যাবে, তাঁদের পরিচয় হবে ‘মেন্টর’। অর্থাৎ ক্লাস শুরুর আগে সমস্ত স্টাডি মেটিরিয়াল অনলাইনে দিয়ে দেওয়া হবে, ছাত্ররা পড়ে আসবে, টিচার ক্লাসে গিয়ে শুধু তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন।

দ্বিতীয়ত, একজন ছাত্র কী বিষয়ে পড়বে সেই সিদ্ধান্ত একজন ছাত্র নেবে, মানে কেউ ফিজিক্সের সঙ্গে নিতে পারবে বাংলা কবিতা। শুধু তাই নয়, একজন ছাত্র কোন টিচারের কাছে পড়বে সেটাও ঠিক করবে ছাত্ররাই। অনেকে ভাবছেন ভালোই তো, অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা হল, কিছু বিষয় চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে— টিচারের কোনও গুরুত্ব থাকবে না, যে বিষয়ে সহজে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে সেই বিষয়ই শুধু ছাত্ররা নিতে থাকবে।

এখানেই শেষ নয়। ছাত্ররা পরীক্ষার পর নম্বর পাবে না। তাদের ক্রেডিট ব্যাঙ্ক তৈরি হবে। অর্থাৎ একটি ছাত্র বিভিন্ন বিষয় পড়ে ক্রেডিট ব্যাঙ্ক তৈরি করবে। পড়াশোনার কোনও সময়সীমা থাকবে না, পড়তে পড়তে সে যে কোনও দিন তা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে, আবার বছর চার পর সেখান থেকে শুরুও করতে পারবে। আরেকটি বিষয় ভাবতে হবে। ভারতবর্ষের যে সব গ্রামে ইন্টারনেটের টাওয়ার পেতে গাছের ডালে উঠতে হয়, সেসব প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় পৌঁছবে! এই এডুকেশন পলিসি ভারতবর্ষের চিরাচরিত গুরু-শিষ্য পরম্পরা, অধ্যবসায় ভিত্তিক পড়াশোনার মূলে আঘাত হেনেছে। দু’দিন পর স্কুল কলেজ উঠে যাবে, মাস্টারের চাকরি উঠে যাবে। যে স্বপ্ন স্যাম পিত্রোদা ২০০৫ সালে দেখেছিলেন যে একটি কম্পিউটার ও পাঁচজন ভালো শিক্ষক থাকলে স্কুল কলেজের কী দরকার— সেই স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে।

অনলাইন ক্লাস ছিল আমাদের কাছে দায়ের বিষয়। কিন্তু আজ প্রায় দেড় বছর স্কুল কলেজ বন্ধ করে ঘটতে চলেছে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। ইন্টারনেট ভিত্তিক পড়াশোনা হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে জিওর মতো কোম্পানি, কারণ লোক ডেটা কিনবে। সুন্দর পিচাই তো পরিসংখ্যান দিয়েছেন ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ইন্টারনেট ব্যবহার হয়েছে ১৬ গুণ বেশি। ভাবুন জনসাধারণের, আমাদের পয়সাগুলো কোথায় যাচ্ছে!

এই ব্লেন্ডেড মোড বিদেশের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই ‘স্যানজোস বিশ্ববিদ্যালয়ের’ শিক্ষকরাও এখন প্রতিবাদপত্র লিখে বলেছেন, এইব্লেন্ডেড মোড সিস্টেম হল ‘সিরিয়াস সোশ্যাল ইনজাস্টিস’। ব্লেন্ডেড মোড এই সিস্টেম চালু করার প্রচেষ্টা যথারীতি শুরু হয়ে গেছে, কলেজ টিচারদের রিফ্রেশার্স কোর্স বা এনএএসি (ন্যাক)-এর স্কোরিং পদ্ধতিতে ব্লেন্ডেড মোডে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লেকচার রেকর্ড করে বাজানো হবে অনলাইন ক্লাসে। তাতে শিক্ষা খাতে সরকারকে টাকা বরাদ্দ করতে হবে না। ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে যাবার দরকার নেই। রোবট টিচারের কাছে বাড়িতে বসেই মোবাইলে পড়াশোনা চলবে। তারাও ভবিষ্যতে গল্প শুনবে এক সময় স্কুল-কলেজ নামে কিছু ঘরবাড়ি ছিল, মাস্টারমশাই নামের কিছু অযোগ্য জীবরা ক্লাস নিত। আগামী দিনের মার্গি জোন্সরা যত শুনবে ততই অবাক হয়ে যাবে।

নীল রায়, ই-মেলে প্রাপ্ত

কমরেড ভূপেন্দ্র নাথ কাকতির জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের আসাম রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, দরং জেলা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক কমরেড ভূপেন্দ্র নাথ কাকতি ২৪ জুলাই মঙ্গলদৈয়ে নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

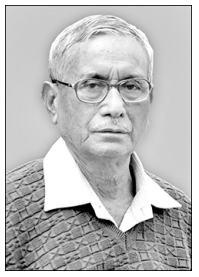

১৯৭৭ সালে মঙ্গলদৈ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের সময় মঙ্গলদৈ কলেজে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক প্রয়াত মিনহার আলি মণ্ডলের সঙ্গে দল ও মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার পর দলের তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক, বর্তমানে পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের সাহচর্য ও আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমরেড কাকতি দলের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। তারপর তিনি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক, এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন বই গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এই দৃঢ় মতে উপনীত হন যে ভারতবর্ষে শোষিত মানুষের শোষণমুক্তির একমাত্র হাতিয়ার এস ইউ সি আই (সি) দল এবং দলের নির্দেশিত পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি কালবিলম্ব না করে এস ইউ সি আই (সি) দলের কাজেকর্মে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন ও ছাত্র-যুবকদের দলে যুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সাল থেকে আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোর প্ররোচনায় ছ’বছর ধরে তথাকথিত বিদেশি বিতাড়নের নামে চলা আন্দোলন রাজ্যের আকাশ-বাতাস যখন উত্তাল করে তুলেছিল সে সময়ে আন্দোলন সংক্রান্ত প্রশ্নে দলের সিদ্ধান্তকে তিনি সঠিক বলে বিবেচনা করেন এবং এই আন্দোলন যে রাজ্যের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করে শোষক শ্রেণিকে সাহায্য করবে তা উপলব্ধি করেন। তিনি ওই আন্দোলনের সঙ্গে নীতিগতভাবে যুক্ত না হওয়ায় তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা কয়েকবার তাঁকে আক্রমণ ও হত্যার হুমকি দেয়। পাশাপাশি তাঁর ঘরে লুঠতরাজ চালায়। শেষে তিনি ভাড়া ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুর্দান্ত সাহসী, যুক্তিবাদী, মনোবলে বলীয়ান কমরেড কাকতি এত অত্যাচার সহ্য করার পরও মাথা নত করেননি এবং দলের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস ছিল অবিচল।

কমরেড কাকতির সংগ্রামী জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নেতৃত্বের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত আনুগত্য, যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রাণসত্তা। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে বিপ্লবী জীবনের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারেননি কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে দলের কাছে কখনও কোনও সাহায্য চাননি, ব্যক্তিগত কারণে দলের কাজকর্ম থেকে দূরে থাকেননি এবং নেতৃত্ব বা জুনিয়র কমরেডদের কঠোর সমালোচনাও যুক্তি সহকারে গ্রহণ করতেন। দলের নেতৃত্বের নির্দেশে যে কোনও কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও চাকরির বাধ্যবাধকতা, ঘরোয়া পরিবেশ বা সামাজিক পরিবেশের দোদুল্যমানতার অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত হতে দেখা গেলেও তাঁকে কখনও হতাশ হতে দেখা যায়নি।

দলের আহ্বানে সরকারের যে কোনও ধরনের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি নিজেকে দ্বিধাহীনভাবে যুক্ত করতেন, বিশেষভাবে দলগাঁও পাটকল স্থাপনের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আসাম কলেজ-শিক্ষক সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য থাকাকালীন রাজ্যের শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে আসাম সরকার কলেজ-শিক্ষকদের স্বাধিকার হরণের উদ্দেশ্যে কলেজ-শিক্ষক পদ প্রাদেশিকীকরণের (প্রোভিনশিয়ালাইজেশন) যে অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে কলেজ-শিক্ষকদের সংগঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ফলে তখন সরকার এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের জনবিরোধী নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, সর্বনাশা সর্বশিক্ষা অভিযান বা শিক্ষার বেসরকারিকরণ, গেরুয়াকরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দলের নির্দেশে আসামের বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য-সহযোগিতায় আসামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে গুয়াহাটির ভরলুমুখে সাধারণ মানুষের আর্থিক অনুদানে মহৎ প্রাণ মহান শিল্পী রূপকোঁওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার যে পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, সেই কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৮৮ সালে দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে তিনি দলের আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু সেই পদে বহাল ছিলেন। দলের দরং জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে ৩৩ বছর কার্যনির্বাহ করা কমরেড কাকতির মৃত্যুতে দলের গুরুতর ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি আসামের শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অভাব অনুভূত হচ্ছে। কমরেড কাকতির মৃত্যুতে দল একজন অতি নিষ্ঠাবান নেতাকে হারালো। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে জেলার কমরেডরা ছাড়াও বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস এবং পলিটবুরো সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব গুয়াহাটি থেকে কমরেড কাকতির বাসভবনে উপস্থিত হন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। দুপুর ২টায় তাঁর মরদেহ মঙ্গলদৈস্থিত দলের জেলা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হলে প্রিয় কমরেডকে শেষবার প্রত্যক্ষ করতে বহু কমরেড এবং শুভানুধ্যায়ী সেখানে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর মরদেহ রক্তপতাকায় মুড়ে অস্থায়ী মঞ্চে রাখা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের পূর্বে উপস্থিত কমরেডরা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মাল্যদান করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে কমরেড কান্তিময় দেব, দলের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস প্রমুখ। উপস্থিত রাজ্য এবং জেলা কমিটির সদস্যরা তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। আর্ন্তজাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাঁকে শেষবিদায় জানানো হয়।

কমরেড ভূপেন্দ্র নাথ কাকতি লাল সেলাম

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস স্মরণে

তিনের পাতার পর

বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির কিছু প্রতিবাদ আন্দোলনও গড়ে উঠছিল। খুব সংক্ষেপে, এই পটভূমিতেই মার্কস-এঙ্গেলসের আবির্ভাব ও তাঁদের সংগ্রামের সূচনা ঘটেছিল।

এতকাল ধরে চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শ্রেণি বিভাজন, ধনী-গরিব ও শোষক-শোষিতের মধ্যে বিভাজন হল শাশ্বত ও চিরন্তন। তাঁরা এভাবে চিন্তা করতেন, কারণ হাজার হাজার বছর ধরে প্রথমে আদিম সমাজ ভেঙে দাসপ্রভু ও দাসে বিভক্ত হয়ে দাসব্যবস্থা, তারপরে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসে বিভক্ত সামন্ততন্ত্র এবং তারও পরে দুই বিরোধাত্মক শ্রেণি হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে পুঁজিবাদ এসেছে— যা আজও চলছে। এই শ্রেণিবিভাগ দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাসে উপনীত করেছে যে শ্রেণি বিভাজন চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত।

আরেকটি দৃঢ় ধারণা দার্শনিকদের মধ্যে ছিল। তাঁরা মনে করতেন, প্রকৃতিজগতের পিছনে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগেই একটা দৈবশক্তি এবং পরম ভাব ছিল— যা আমাদের সমাজজীবন সহ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সমস্ত কিছুই পরম সত্তার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে। সেই অনুযায়ী শ্রেণি বিভাজন ও শোষণও পূর্বনির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। শোষিত মানুষও এই ঘটনাকে পরম সত্য বলে মনে করত। এই চিন্তা কি সঠিক ছিল? বিভিন্ন মতবাদের গভীর অধ্যয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে হেগেল ও ফুয়েরবাখের দর্শনকে, অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং সেন্ট সাইমন, রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়েরদের 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্র' সংক্রান্ত ধারণাগুলোকে কষ্টসাধ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কস বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে এলেন যে, এই সমস্ত ধারণাগুলি ভ্রান্ত এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, একমাত্র বস্তুজগৎই সত্য। প্রকৃতি জগতের পিছনে কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব নেই। কোনও দৈবশক্তি বা পরম ভাব বস্তুজগৎকে নিয়ন্ত্রণ বা পূর্বনির্ধারিত পথে পরিচালনা করছে না। বস্তু গতিশীল এবং তা ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে। প্রতি মুহূর্তে কোনও বস্তুসত্তার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ক্রমাগত বস্তুসত্তার ধ্বংসও হচ্ছে। একইভাবে শ্রেণি বিভাজনও চিরন্তন সত্য নয়। প্রাচীন সমাজে বা আদিম সমাজে কোনও শ্রেণি ছিল না। তখন কোনও ব্যক্তিসম্পত্তি ছিল না এবং সেই কারণেই সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার ধারণাও ছিল না। উৎপাদনের বিকাশের পথ বেয়ে পরবর্তীকালে সমাজে শ্রেণি বিভাজন এসেছে। সমাজব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রেণিবিভক্ত দাসব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ— সমস্ত সমাজব্যবস্থাই সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম মেনে একটির পর আরেকটি এসেছে। একই নিয়ম মেনে শ্রেণিবিভাজন বিলুপ্ত হবে এবং শ্রেণিহীন সমাজের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এই বিশ্বপ্রকৃতিতে বস্তুজগতের সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত জানা সর্ববৃহৎ গ্রহ— সমস্ত কিছুই সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হচ্ছে। একইভাবে, মানব-ইতিহাসও সুনির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে এবং কতগুলি সর্বজনীন সাধারণ নিয়ম আছে যা প্রকৃতিজগৎ ও মানবসমাজ উভয়কে পরিচালিত করছে। এই বিজ্ঞানসম্মত মানবমুক্তির আদর্শের জন্য এই দুই মহান চিন্তানায়ক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন— যদিও তাঁদের জীবিতকালে তাঁরা স্বীকৃতি পাননি। এই ঐতিহাসিক অবদানের জন্য মানবজাতি তাঁদের কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবে। আজ ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমার আলোচনা মূলত এঙ্গেলস কীভাবে মার্কসকে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে সাহায্য করেছেন তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

একজন শিল্পপতির সন্তান পরিবর্তিত হয়েছিলেন সর্বহারা শ্রেণির পথপ্রদর্শকে

এখন পর্যন্ত আমি যা আলোচনা করলাম, তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার শিক্ষায় যতটুকু আমি বুঝেছি, তার ভিত্তিতেই। এখন আমি মূলত এঙ্গেলস ও লেনিন থেকে উদ্ধৃত করে পড়ব। এসব আপনাদের কাছে কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। অনেকের কাছে একঘেয়েমি মনে হতে পারে। কিন্তু আমি নিরুপায়। সময়ের স্বল্পতার জন্য আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। আমাদের সংগ্রামকে পথ দেখাতে এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি খুবই প্রয়োজনীয় বলে আপনাদের ধৈর্য ধরে শুনতে অনুরোধ করব। এসব বলার পর যদি সময় পাই, আমি আরও কিছু বিষয় আলোচনা করব।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এটা জেনে বিস্মিত হবেন যে একজন শিল্পপতির সন্তান, যিনি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি পরিবর্তিত হয়ে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করার পথনির্দেশক হয়ে উঠেছিলেন।

এঙ্গেলসের পিতা ছিলেন একজন শিল্পপতি। চোদ্দ বছর বয়সে এঙ্গেলসকে হাইস্কুলে পাঠানো হয়েছিল, যাকে তাদের দেশে 'জিমনাসিয়াম' বলা হত। সেখানে পড়াশোনা শেষ করার আগেই তাঁর পিতা তাঁকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করেন এবং লেখাপড়া করার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নিকটবর্তী একটি শহরে তাঁকে ব্যবসা পরিচালনা করার শিক্ষা নিতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এঙ্গেলসের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিলই। যখন তিনি অল্প বয়সী স্কুলছাত্র, তিনি ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা শিখে ফেলেন। স্কুলে পড়ার সময়ই ফরাসি ও জার্মান সাহিত্য পড়েন। যখন তাঁকে ব্যবসা পরিচালনা শিখতে পাঠানো হল, সেখানেও তিনি নিজের মতো করে পড়াশুনা চালিয়ে গেলেন। তিনি সক্রেটিস, প্লেটো, স্পিনোজা এবং হেগেলের দর্শন পড়ে ফেললেন। তাঁকে এক বছরের আবশ্যিক সামরিক শিক্ষার জন্য বার্লিনে পাঠানো হয়। বার্লিনে তিনি ফুয়েরবাখের দর্শনের সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে তিনি ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষা আয়ত্ত করেন। সহজেই তিনি ১২টা ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারতেন এবং ২০টা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। দর্শন, অর্থনীতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য— অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তিনি জ্ঞানচর্চা চালিয়ে যেতেন। এমনই ছিল তাঁর জ্ঞানের তৃষ্ণা।

(চলবে)

কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মনের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কোচবিহার জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য, অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এবং কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন নিউমোনিয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ১৮ জুলাই সকালে কোচবিহারের ডাঃ পি কে সাহা হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাকুঠি গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন ১৯৫০ সালে কোচবিহারের ভারতভুক্তির পর তাঁর কৈশোরেই নিজ এলাকায় বেনাম জমি-খাস জমি উদ্ধার ও গরিব চাষিদের মধ্যে বিলি করার মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হন। এর মধ্য দিয়ে তিনি এলাকার বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম একজন সংগঠক হয়ে ওঠেন। সে সময় তিনি অবিভক্ত সিপিআই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে দল ভাগ হলে তিনি সিপিআইএম দলের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। এলাকার জনসাধারণের নানা দাবি নিয়ে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এলাকার জননেতায় পরিণত হন। তিনি রাজ্যসভার সাংসদ এবং বিধানসভার সদস্য হিসাবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৯৩-৯৪ সালে তুফানগঞ্জের একদল সিপিএম নেতা-কর্মী দলের অ-মার্কসবাদী নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রূপ দেখে ওই দল সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সঠিক বামপন্থী দল খুঁজতে গিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদ, কমরেড মৃণাল আচার্য ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৫ সালে তাঁদের মাধ্যমে কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মনের সাথে এস ইউ সি আই (সি) দলের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। দলের তৎকালীন জেলা সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত চৌধুরীর সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি এই আদর্শকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই আদর্শে অবিচল ছিলেন।

এস ইউ সি আই (সি)-তে যুক্ত হওয়ার সময় তৎকালীন শাসক দলের একজন বিধায়ক এবং প্রাথমিক স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তিনি দলের একেবারে সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। পরিষদীয় পদের মোহ এবং ক্ষমতার রাজনীতিকে তিনি হেলায় ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। এ ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা বা সংকোচ তাঁর ছিল না। এই প্রশ্নে তিনি চরিত্রের অত্যন্ত উন্নত মান প্রতিফলিত করেন। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তিনি দলের সদস্যপদ অর্জন করেন এবং ২০০৯ সালে তিনি জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। জেলা জুড়ে শিক্ষা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। জেলার বহু গণআন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ ক্ষেত্রে নিজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সদস্য সংগ্রহ, গ্রাম স্তরে প্রচার থেকে শুরু করে আন্দোলনের একেবারে তৃণমূল স্তরের বহু কাজ নিজে হাতে করতেন। কোনও মিথ্যা অহং তাঁকে এ কাজে আটকায়নি। শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি পুরোপুরি কৃষক আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। ২০১২ সালে তিনি এ আই কে কে এম এস-এর কোচবিহার জেলা সম্পাদক এবং ২০১৬ সালে সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ২০২০ সালে কৃষক লং মার্চ সংগঠনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও তিনি দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

সত্য জানার আকাঙ্ক্ষা, সততা, নিষ্ঠা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। দলের তত্ত্বের কথাগুলিকে তিনি অত্যন্ত সহজ করে উপস্থিত করতে পারতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণের প্রশ্নে তিনি কোনও সংকীর্ণ চিন্তার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না। জনজাতি, উত্তরবঙ্গের নানা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর পরিবারকে তিনি বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন, চরিত্রমাধুর্য, সরলতা ও সর্বক্ষণ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা মানুষকে আকর্ষণ করত। এর মধ্য দিয়ে তিনি বহুজনকে দলের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের কর্মী-সমর্থকরা হাসপাতালে সমবেত হন। ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে তাঁর মরদেহ আনা হলে দলের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিশির সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ২ আগস্ট তুফানগঞ্জ কমিউনিটি হলে তাঁর স্মরণসভায় দলের কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ ও অন্য বামপন্থী দলের কর্মী-সমর্থকরা সমবেত হন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও এআইকেকেএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ, দলের জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন।

কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মনের মৃত্যুতে দল হারালো এক বিশিষ্ট সংগঠককে, কোচবিহার জেলার বামপন্থী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হারালো।

কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা

সর্বহারার মহান নেতা, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৬তম স্মরণ দিবস ছিল ৫ আগস্ট। ওই দিন দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বাংলায় ভাষণ দেন। ১৩ আগস্ট অনলাইন সভায় তিনি ইংরেজিতে ভাষণ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের পলিট বুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক ওই দিন এই সভার বক্তব্য শোনেন।

১১ আগস্ট ঃ ক্ষুদিরামের স্বপ্ন সফল করার শপথ

১১ আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন বিপ্লবীধারার কিশোর শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের ১১৪তম দিবস। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় পালন করলেন এই দিনটিকে।

মূল অনুষ্ঠান হয় কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির মুহূর্ত সকাল ৬টায় শহিদের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল এবং পথিকৃৎ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাল্যদান করেন এসইউসিআই (সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং আয়োজক সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ। কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমল গার্ড অফ অনার জানায়। ক্ষুদিরামের অপূরিত স্বপ্ন শোষণহীন ভারত গড়ার শপথ গ্রহণ করেন উপস্থিত সকলে। বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড শুভঙ্কর চ্যাটার্জী, সভাপতিত্ব করেন এআইএমএসএস-এর কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনন্যা নাইয়া। রাজ্যের সর্বত্র সংগঠনগুলির উদ্যোগে ক্ষুদিরামের মূর্তি অথবা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শপথ গ্রহণ, আলোচনা প্রভৃতি অজস্র অনুষ্ঠান চলে সারা দিন জুড়ে।

কলকাতা

স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণ!

একের পাতার পর

পুঁজিবাদী দেশগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে। তবু কেন এঁদের চোখের জল মোছানো গেল না? কেন এই সম্পদ সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছে পৌঁছল না? আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে দিগন্ত-প্রমাণ বৈষম্য, যা ক্রমাগত কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি সেদিন রাষ্ট্রনায়করা দিয়েছিলেন, কমা দূরে থাক, কেন তা বেড়ে আসমান-জমিন হয়ে গেল? তবে কি সেদিন তাঁরা যা বলেছিলেন তা শুধুমাত্র দেশের মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য? যে পথে তাঁরা নিপীড়িত মানুষের চোখের জল মোছাতে চেয়েছিলেন তা কি সঠিক ছিল? কারণ উদ্দেশ্য যতই সৎ হোক, পথ যদি সঠিক না হয় তবে লক্ষ্যে কিছুতেই পৌঁছানো সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার পরে দেশ শাসনের ভার যাঁরা নিলেন, তাঁরা পুঁজিবাদী আর্থিক উন্নয়নের রাস্তাতেই এগোতে থাকলেন। এ কথা ঠিক, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অনুকরণে তাঁরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিতে থাকলেন। ভারী শিল্প এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় স্থাপিত হল। সামাজিক ক্ষেত্রে দারিদ্র দূরীকরণের নানা প্রকল্পও নেওয়া হল। কিন্তু এ-সব কোনও কিছুই সাধারণ মানুষের জীবনে উন্নয়নের কোনও ছোঁয়াই নিয়ে এল না। এর কারণ কী? আমাদের শিক্ষক, মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সেদিনই দেখিয়েছিলেন, এই যে সব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যাকে অনেকে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ বলে ভুল করছেন, সেগুলির উদ্দেশ্য পুঁজিবাদকে বিকশিত করা, শক্তিশালী করা। কারণ রাষ্ট্রটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং তা পরিচালনা করছে পুঁজিপতি শ্রেণি। যদিও পুঁজিপতিরা কখনওই একে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে না। তারা বলে এটি একটি জাতীয় রাষ্ট্র, অর্থাৎ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদকেই তারা এই রাষ্ট্রের আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে। অথচ একটি স্বাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের আদর্শ আর কোনও প্রগতিশীল আদর্শ হিসাবে কাজ করে না। যতদিন স্বাধীনতা না এসেছে, ততদিন এই জাতীয়তাবাদ আদর্শ হিসাবে ছিল প্রগতিশীল। বহু ধর্ম বহু বর্ণ বহু ভাষার মানুষের এক জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকলকে সামিল করতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ সেদিন ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার মুক্তির পথে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছিল সকলেরই সাধারণ শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু যখনই একটি সার্বভৌম, জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে ভারত আবির্ভূত হল, তখনই আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ল। কারণ তা পুঁজিবাদী শোষণের আদর্শগত হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল এবং শোষিত শ্রেণির মুক্তির রাস্তায় বিরাট বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। কারণ জাতীয় রাষ্ট্র মানেই তা বুর্জোয়া রাষ্ট্র, ধনী-দরিদ্রে, শোষক-শোষিতে বিভক্ত সমাজে শাসক পুঁজিপতিদেরই স্বার্থরক্ষাকারী রাষ্ট্র। পুঁজিপতিদের বিকাশ, তাদের স্বার্থরক্ষা, তাদের মুনাফা বাড়িয়ে চলাই রাষ্ট্রের যে কোনও নীতি, যে কোনও আইনের একমাত্র লক্ষ্য। আর তারই বলি হয়ে চলেছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

আজ আকাশছোঁয়া বৈষম্য দেখে কোনও কোনও পুঁজিবাদী পণ্ডিত বলছেন, বণ্টনের সাম্য না থাকার ফলেই বৈষম্য এই চেহারা নিয়েছে। যেন বণ্টনের সাম্য তৈরিটা একটা পদ্ধতিগত ব্যাপার এবং সেটা ঠিক করে নিলেই আর কোনও সমস্যা থাকবে না। বণ্টনের বৈষম্য পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি! কারণ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য সামাজিক, উৎপাদনের প্রক্রিয়াটা সামাজিক কিন্তু মালিকানা ব্যক্তিগত। তাই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিকে অটুট রেখে কারও ইচ্ছায় কখনও এই বৈষম্য দূর হতে পারে না। কারণ ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের পুঁজি তথা সম্পদের জন্মই হয় শ্রমিক এবং জনগণকে শোষণের, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে। অসম বণ্টন পুঁজিবাদী সমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

ভারত আজ একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। পুঁজির কেন্দ্রীভবন আজ অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এক শতাংশ পুঁজিপতি দেশের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশের মালিক। গত দশ বছরে শত কোটিপতির সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্টোদিকে বেশির ভাগ দেশবাসী নিঃস্ব, রিক্তে পরিণত হয়েছে। গত লকডাউনের সময়ে যখন দেশের বেশির ভাগ মানুষ কাজ হারিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, ঠিক তখনই অনিল আম্বানির সম্পদ বেড়েছে ৩৫ শতাংশ হারে। যেখানে দেশের ২৪ শতাংশ মানুষ মাসে ৩ হাজার টাকা রোজগার করেছেন, সেখানে মুকেশ আম্বানি ঘণ্টায় রোজগার করেছেন ৯০ কোটি টাকা। এই বৈষম্য সীমাহীন শোষণের ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

তা হলে কি স্বাধীন দেশে এই শোষণ, এই বঞ্চনা, প্রতারণা থেকে রেহাইয়ের কোনও রাস্তাই ছিল না? অবশ্যই ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি পুঁজিপতিদের হাতে না থেকে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি তথা যথার্থ কমিউনিস্টদের হাতে থাকত, চীনে যেমন সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা মিত্র হিসাবে সেই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল, যদি ভারতেও তা ঘটত তবে স্বাধীন ভারতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে প্রথমে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং বিকাশের পথে পরে তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হত। একমাত্র এই পথেই শোষণকে খতম করা, সম্পদের পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে সমবণ্টন সম্ভব হত।

আজ মাত্রাহীন শোষণের প্রক্রিয়াটি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ঝাণ্ডা উড়িয়েই চলছে। জাতীয়তাবাদের নামেই বিজেপি শাসনে মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, বিরোধী কণ্ঠকে রোধ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই শোষিত মানুষের মনে এ প্রশ্ন বার বার উঠছে যে, একে বন্ধ করার কি কোনও উপায়ই নেই? বাস্তবে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রেখে এই কুৎসিত বৈষম্য বন্ধ করার অন্য কোনও উপায় নেই। একে বন্ধ করতে হলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভাঙতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ ছাড়া শোষিত মানুষের মুক্তির আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। আজ প্রয়োজন জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলা এবং সেই আন্দোলনগুলিতে সমস্ত স্তরের শোষিত মানুষকে সামিল করা। গণআন্দোলনের এই পথেই শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার অজস্র গণকমিটি গড়ে উঠবে, যা একদিন একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হবে। সেই শেষ যুদ্ধে শোষিত শ্রেণির মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com